The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 12, No. 23-24, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

নারী-পুরুষের ভাষা ও ভাষার লৈঙ্গিকতা

গুলশান আরা*

Abstract: Language variation is very important part of Sociolinguistics. There are some significant differerces in how language develops and how people tend to express themselves based on gender. Gender has a profound effect on language. Sociolinguists investigate varities of speech associated with a particular gender, they demonstrate a strong relationship between gender and how language is acquired, developed and used. Men tend to use language more assertively; on the other hand women use language rationally. Men exclude emotions from their language, but women express their emotions through language. On the contrary, language itself can be sexist. Socialization processes also play a vital role on the use of language of men and women.

চাবি শব্দ: জেন্ডার বৈষম্য, জৈবিক-লিঙ্গ, সামাজিক-লিঙ্গ, লৈঙ্গিক ভাষা, পার্থক্য তত্ত্ব, আধিপত্য তত্ত্ব, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান, সামাজিকীকরণ

সৃষ্টির আদি থেকেই প্রকৃতি প্রদত্ত নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে দৈহিক আকার-আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য। মানব সভ্যতার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে বর্তমান কালে, এই একবিংশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে আকার-আকৃতিগত পার্থক্য ছাপিয়ে গেছে জেন্ডার বৈষম্য, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ফুটে ওঠেছে নারীর সমাজিক অবস্থা ও অবস্থান এবং নারীর ভাষায় ও নারীর প্রতি ব্যবহৃত ভাষায়। নারী কেবল বিধাতাসৃষ্ট নয়, বরং হয়ে ওঠেছে পুরুষসৃষ্ট অর্ধ-সত্য মিশ্রিত কাল্পনিক এক চরিত্র, যার নিজস্বতার চেয়ে আরোপিত বৈশিষ্ট্যই আরাধ্য–সে কথাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মানসী' কবিতায়-

> শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী
> পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
> আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
> সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
> ...
> অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা। (ঠাকুর, ২০১১: ৩১)

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারীকে অবলোকন করার এ দৃষ্টি কেবল একজন পুরুষ কবিরই নয়, বরং সমগ্র পুরুষ জাতি তথা পুরুষশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ-ভাবনারই প্রতিচ্ছবি। এই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের পার্থক্য, যা তাদের ভাষা-পার্থক্যে পরিণতি পেয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর জীবন ব্যবস্থার রূপকার এবং নিয়ন্ত্রকও একজন পুরুষ। শিল্প-সাহিত্যে আধুনিক নারীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রথম সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে হেনরিক ইবসেনের নাটক 'A Doll's House'-এর উল্লেখ না করলেই নয়। প্রায় দেড়শ' বছর আগে (১৮৭৯ সালে প্রথম প্রকাশ) সংসারের ঘেরাটোপে আবর্তিত আত্মমর্যাদাহীন পুতুল জীবনকে পেছনে ফেলে কেন্দ্রীয় চরিত্র নোরা বিশাল পৃথিবীর অনিশ্চত কিন্তু স্বাধীন জীবনকেই বেছে নেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষিক সমাজে নারী ও পুরুষের ভাষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাষা-পার্থক্যের কারণ হিসাবে তিনটি বৃহৎ পরিসরের কথা উল্লেখ করা যায়: শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। এ তিনটি কারণের মধ্যে অন্যতম সামাজিক বিভাজন। নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্য অনুধ্যান আধুনিক কোন বিষয় নয়। এর প্রচীনতম উদাহরণ পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকে, যেখানে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক উপভাষায় কথা বলে। অটো জেসপারসন (১৯২২: ২৩৭) নারীর ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন-

> পুরুষের নিজস্ব কিছু প্রকাশভঙ্গি রয়েছে যা নারীদের বোধগম্য হলেও তারা তা ব্যবহার করে না, তেমনি নারীদেরও কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ আছে যা পুরুষেরা ব্যবহার করে না, করলেও তা হাস্যকর বলে ধরে নেওয়া হয়। তাদের কথাবার্তায় এমনই মনে হয় যেন নারীরা পুরুষের চেয়ে আলাদা কোনো ভাষা ব্যবহার করছে।

তিনি নারী-পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে ট্যাবু বা সামাজিক বিধি-নিষেধকেই দায়ী করেন। পিটার ট্রাজিল নারী-পুরুষের ভাষার তারতম্যকে 'সামাজিক দূরত্ব (social distance)' না বলে 'সামাজিক পার্থক্য (social differences)' বলে অভিহিত করেছেন (১৯৭৪)। তিনি ট্যাবু শব্দকে নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্যের কারণ বলে মানতে রাজি নন বরং আত্মীয়বাচক শব্দ এবং ভাষার লিঙ্গ পদ্ধতি এজন্য দায়ী বলে মনে করেন। ফিশার-এর মতে, (১৯৬৪) মেয়েরা ছেলেদের চাইতে বেশি প্রমিত রূপ ব্যবহার করে। তিনি ইংরেজি ভাষায় -ing -এর উচ্চারণ পর্যালোচনা করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সমাজভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথের মতে, "...ষাটের দশক থেকে আরো বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নারী-পুরুষের ভাষাভেদ মার্কিন ও ব্রিটিশ সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেন তাঁদের গবেষণায়। লেবোভ, ট্রাডগিল (ট্রাজিল), সুই, লেকফ, মিলরয়, মেকলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম" (১৯৯৯ : ৯৮)। ১৯২৭ সালে রচিত 'বাঙলায় নারীর ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে সুকুমার সেন নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেন, "পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদা বলেই

এই পার্থক্যের উদ্ভব" (আজাদ ১৯৮৫ : ৬৭২)। এছাড়া মৃণাল নাথ, রাজীব হুমায়ুন নারী পুরুষের ভাষা-পার্থক্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানে লিঙ্গ (sex) একটি 'চলক' (variable), যা নারী ও পুরুষের ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করে।

নারী দুর্বল, অক্ষম এবং কোনো অবস্থাতেই পুরুষের সমকক্ষ নয়-এমন ধারণাকে ভিত্তি করে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য সমাজ গড়ে ওঠেছে। এমনকি, প্রধান প্রধান ধর্মানুসারে নারী পুরুষের অধীন (হোসেন ও অন্যান্য, ২০০৬)। নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, সুদূর অতীতে নারী ছিল কর্তৃত্বশীল এবং বিশ্বে এক সময় নারী ঈশ্বর বিরাজ করতেন, যে কারণে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয় (মোহাম্মদ, ২০১২)। বর্তমান প্রবন্ধে, নারীর অধস্তন ভূমিকার কারণ, ভাষার ওপর এর প্রভাব এবং নারী-পুরুষের ভাষা-পার্থক্যের আলোকে বাংলা ভাষার লৈঙ্গিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

লৈঙ্গিক ভাষা ও ভাষায় লৈঙ্গিকতা

কেবল ব্যবহারের কারণেই নয়, ভাষা স্বয়ং হয়ে ওঠতে পারে লৈঙ্গিক। এক্ষেত্রে দুটি পারিভাষিক শব্দ 'জৈবিক- লিঙ্গ (sex)' ও 'সামাজিক-লিঙ্গ (gender)' বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। 'Whereas the word 'sex' …refers to *anatomy* and *biological* differences between men and women, 'gender', on the other hand, is used to mean the differences between men and women which are *psychological, cultural* or *social'* (Clements et al. 2000: 62). জৈবিক-লিঙ্গ একটি জৈবিক-বর্গ (Biological category), যা প্রকৃতি প্রদত্ত এবং মানব শিশুর জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, আর সামাজিক-লিঙ্গ একটি সামাজিক-বর্গ (Social category) যা, কিছু আচরণের দ্বারা প্রকাশ পায় এবং সমাজের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। ভাষার ক্ষেত্রে নারীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্মতা জৈবিক কিন্তু বহুল পরিমাণে যোজক প্রশ্নের (tag question) ব্যবহার সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। 'লৈঙ্গিক ভাষা (sexist language)' একই ভাষা সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীকে পৃথকরূপে উপস্থাপিত করে। এর দ্বারা এক লিঙ্গের মানুষ অন্য লিঙ্গের মানুষের চেয়ে অসম্পূর্ণ, অগুরুত্বপূর্ণ কিংবা কম অধিকার সম্পন্ন হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। লৈঙ্গিক ভাষা পুরুষ কিংবা নারীকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিতে পারে, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর জন্য ভাষাটি নেতিবাচক হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজে এবং পৃথিবীর বেশির ভাগ সমাজে সাধারণত, নারীর চেয়ে পুরুষেরাই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কাজগুলো বেশি করে থাকে, বেশি সম্পত্তির অধিকারী এবং অধিক টাকা উপার্জনকারী। বিশ্বে এখনও রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিচারক, চিত্র পরিচালক কিংবা অফিসের বড়কর্তা হিসেবে পুরুষদেরই বেশি দেখা যায়। পুরুষের এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাকে

ক্ষমতাশালী করে তোলে। ভাষা ব্যবহারের সাথে ক্ষমতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, ক্ষমতার বণ্টনে নারী পুরুষের চেয়ে বেশ নিম্নতর অবস্থানে রয়েছে (Thomas et al, 2004)।

একটি ভাষা লৈঙ্গিক হবে তখনই, যখন তা নারীকে পুরুষের চেয়ে আলাদাভাবে উপস্থাপন করবে। লৈঙ্গিক ভাষাকে দুভাবে বিবেচনা করা যায়: প্রথমত, ভাষাটি স্বয়ং লৈঙ্গিক কি-না; দ্বিতীয়ত, ভাষার ব্যবহার লৈঙ্গিক কি-না। ভাষা যদি লৈঙ্গিক হয়ে থাকে তবে তার শব্দসম্ভার লৈঙ্গিকতা ধারণ করবে। শব্দগুলো অর্থের দিক থেকে প্রতিসাম্য হবে। বাংলাভাষায় প্রতিসাম্য শব্দের একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো-

জাতিগত নাম	-	মানুষ
পুরুষ বাচক	-	পুরুষ
নারী বাচক	-	নারী
কমবয়সী	-	শিশু
কমবয়সী পুরুষ	-	বালক
কমবয়সী নারী	-	বালিকা

কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটি যর্থাথ প্রতিসাম্যের উদাহরণ নয়, যেমন,

জাতিগত নাম	-	Man
নারী বাচক	-	woman
পুরুষবাচক	-	man
কমবয়সী	-	child
কমবয়সী নারী	-	girl
কমবয়সী পুরুষ	-	boy

এখানে, Man এবং man দুটো একই অর্থ বহন করছে না– প্রথমটি, নারী-পুরুষ-শিশু অর্থাৎ মানুষ অর্থে, দ্বিতীয়টি কেবল পুরুষ অর্থে (নারী-শিশু নয়) ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এটি অপ্রতিসাম্যের উদাহরণ। ইংরেজি ভাষায় প্রতিসাম্যের সঙ্গত একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো-

গণ নাম	-	Horse
পুরুষবাচক	-	stallion
নারীবাচক	-	mare
কম বয়স্ক	-	foal
কম বয়স্ক নারী	-	filly
কম বয়স্ক পুরুষ	-	colt

ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় ইংরেজি ভাষার অপ্রতিসাম্যের একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন Shan Wareing-কে উদ্ধৃত করে Thomas et al (2004) তিনি দেখিয়েছে

পত্রিকার একটি শিরোনামে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুলিশকে 'girl' সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর মতে, নারীর মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে বলে 'girl' সম্বোধন ঐ নারীকে নিশ্চিত করে যে সে এখনও তেমন বয়স্ক হয়ে যায়নি এবং এ ধরনের সম্বোধনকে নারীরা প্রশংসা হিসেবেই গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু একজন ত্রিশোর্ধ পুরুষ পুলিশকে 'police boy' সম্বোধন আদৌ সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে, বাংলা ভাষায় 'মেয়ে' শব্দটি প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হলেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে কখনও 'ছেলে' সম্বোধন করা যায় না।

ইংরেজি ভাষায় প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর নামের আগে মিস/ মিসেস/ মিজ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পুরুষের নামের আগে কেবল 'মিস্টার' ব্যবহৃত হয় যদি না ড., ডা:, বা অধ্যাপক থাকে। নারীর জন্য মিস/ মিসেস/ মিজ যা-ই ব্যবহৃত হোক না কেন তা আসলে ঐ নারীর তত্ত্বাবধায়কের পরিচয়, অর্থাৎ, সে পিতা নাকি স্বামীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে, সেটাই পরিস্কার করা হয়, কারণ মিস ও মিসেস উভয়েই নারীর বৈবাহিক অবস্থা নির্দেশ করে মাত্র। অপেক্ষাকৃত নতুন মিজ-এর প্রচলন হয়েছে পুরুষের সাথে সমতা বিধানের লক্ষ্যে কিন্তু অসমতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে, কারণ 'মিজ' ব্যবহারের ফলে কিছু লোক ধরে নেয় ঐ নারী তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্ত, আর কিছু লোক ভেবে নেয় যে ঐ নারী প্রকটভাবে নারীবাদী (feinmist) অথবা সমকামী (lesbian) (Bauer et al, 2006)। নারীর নামের সাথে বৈবাহিক অবস্থার পরিচয় বহন করাকে ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত করে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ড., ডা:, অধ্যাপক ব্যতিরেকে নারীর নামের আগে মিস বা মিসেস লেখা হয়ে থাকে যেখানে পুরুষের জন্য 'জনাব' সুনির্ধারিত। তবে, খুব বেশি দিন আগে নয়, বাংলা ভাষায় বিবাহিত নারীর নামের আগে 'বেগম' যোগ করা হতো, বর্তমানে তা আর প্রচলিত নয়। নারীদের নামের আগে ডা:, ড., বা অধ্যাপক লেখা হলেও বন্ধনীর ভিতরে হাস্যকরভাবে 'মিসেস' জুড়ে দেয়া থাকে যেন নারীর বৈবাহিক অবস্থা জানা সকলের অবশ্য কর্তব্য। কোনো ভাষায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্য লৈঙ্গিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ইংরেজি 'চেয়ারপার্সন' শব্দটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ হলেও বাংলাদেশে এর ব্যবহার নির্দেশ করে চেয়ারে বসা মানুষটি নারী, ফলে একজন পুরুষ নিজেকে চেয়ারপার্সন পরিচয় দিতে চান না বলে আবার 'ম্যান' হয়ে ওঠেন। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় মানস গঠন এমন হয়ে গিয়েছে যে জেন্ডার নিরপেক্ষ 'পার্সন'-যুক্ত শব্দটি আশ্চর্যজনকভাবে নারীবাচক হয়ে ওঠেছে, এটি ভাষায় জেন্ডার অসংবেদিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভাষার অনেকগুলো শব্দ আছে যা অনির্ধারিত (unmarked), আবার কতগুলো নির্ধারিত (marked), যেমন 'বাঘ' অনির্ধারিত শব্দ, কারণ এর দ্বারা পুরুষ বাঘকে যেমন বোঝায়, তেমনি সমগ্র 'ব্যাঘ্র' জাতিকেও বুঝিয়ে থাকে। বাঘিনী নির্ধারিত কেবল স্ত্রী লিঙ্গের বাঘের জন্য। লৈঙ্গিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন যে, অর্নিধারিত শব্দটিই পুরুষবাচক হয়ে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বাদশা-বেগম, সেবক-সেবিকা, অনাথ-অনাথা, ধোপা-ধোপানি, ইত্যাদি

প্রত্যেক শব্দজোড়ে প্রথমটি পেশা ও পুরুষবাচক উভয় অর্থ জ্ঞাপক, এটিকে নারীবাচক করার জন্য কিছু অন্ত্যপ্রত্যয় কিংবা নারীবাচক শব্দ যোগ করা হয়। পেশাবাচক শব্দ জেন্ডার নিরপেক্ষ (যেমন, অফিসার, ডাক্তার, সার্জন, অধ্যাপক, কবি ইত্যাদি) হওয়ার কথা থাকলেও একথা সত্য যে, মনে করা হয় এই পেশাজীবীরা প্রধানত পুরুষ, তাই দেখা যায় লেডি ডাক্তার, মহিলা অফিসার, মহিলা কবি, অধ্যাপিকা হিসাবে পেশাবাচক শব্দগুলো নারীবাচক করা হচ্ছে। অন্যদিকে 'নার্স' পেশাটি মূলত নারীদের মনে করা হয় বিধায় আমরা 'পুরুষ নার্স' হিসাবে পুরুষবাচক শব্দ পাই। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নার্স পেশা হিসাবে উল্লিখিত অন্য পেশাগুলোর সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়, এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান, সমাজে উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন পেশাসমূহ পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত, অন্যদিকে নার্স, আয়া, বুয়া,ধাত্রী প্রভৃতি নিম্নমর্যাদার পেশাসমূহ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করা হয়। অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোর কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই, যেমন: সতীন, পতিতা, বেশ্যা, বুয়া, কুলটা, ভ্রষ্টা, বন্ধ্যা, সতী ইত্যাদি।

অর্থতাত্ত্বিক পরিবর্তন

ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক জোড়া শব্দের অর্থ সমান নাও হতে পারে। এমন কিছু জোড়া শব্দ রয়েছে যা পুরুষবাচক আর নারীবাচক হিসাবে সমান অর্থ বহন করে না। যেমন, রাজা-রানি, স্বৈরাচার-স্বৈরাচারিণী, বীর-বীরাঙ্গণা, পুরুষমানুষ-মেয়েমানুষ, অগম্য-অগম্যা, কুমার-কুমারী ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ বাংলা ভাষায় রয়েছে। এসব জোড়া শব্দে নারীবাচক শব্দটির অর্থের অবনতি বা semantic derogation ঘটছে, যেমন, ইংরেজি, master-mistress, sir-madam, governor-governess জোড়া শব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের অর্থ সমান নয়, দ্বিতীয় বা নারী বাচক শব্দটি নেতিবাচক এবং যৌনগন্ধী, মর্যাদাও প্রথমটি বা পুরুষবাচক শব্দের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, পুরুষবাচক শব্দটি ক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতা জ্ঞাপক, নারীরা নিকৃষ্ট এবং পুরুষের সেবাদাসী (Bauer et al, 2006)। কিছু বিশেষণ রয়েছে যেমন, খারাপ, নষ্ট, যা ছেলে ও মেয়ের সামনে বসলে তা সামান অর্থ জ্ঞাপন করে না। বাঙালি সমাজে নারীবাদী চিন্তার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া পুরুষকে স্রষ্টা, আর্দশের স্থান থেকে সরিয়ে নারীকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আত্মোপলব্ধির প্রথমপাঠ দান করেন। '*স্ত্রীজাতির অবনতি*' প্রবন্ধে পুরুষের প্রভু হয়ে ওঠা সম্পর্কে তিনি যথার্থই বলেছেন-

> আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাহাদের গৃহপালিত পশুপাখীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি (কাদির, ২০১৬ : ১১)।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- এ 'নারী' শব্দের অর্থ, স্ত্রীলোক; রমণী; মহিলা; পত্নী। নারী শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায়,কামিনী; ললনা; অবলা; প্রমদা; বনিতা; কান্তা; গিন্নি; ঘরনী; অঙ্গনা; অন্তঃপুরিকা; পুরবালা; পুরস্ত্রী; পুরলক্ষ্মী; পুরবাসিনী; বারবধু; বারঙ্গনা ইত্যাদি শব্দ, যেগুলোর অধিকাংশই নারীর জন্য অবমাননাকর এবং নারীকে নিয়ে পুরুষের চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন মাত্র।

বাক্যে লৈঙ্গিকতা

অনেক সময় লৈঙ্গিকতা কোন নির্দিষ্ট শব্দে না থেকে পুরো বাক্য কিংবা বাক্যগুচ্ছে থাকতে পারে। নিচে ইংরেজি ভাষা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

'People feel entitled to the car, The GIRL etc. If they are let down, they blame themselves'. ইংরেজি ভাষায় `People' শব্দটির অর্থ মানুষ/ লোক/জনগণ- এটি নারী কিংবা পুরুষবাচক কোনো শব্দ নয় অর্থাৎ জেন্ডার নিরপেক্ষ, কিন্তু উল্লিখিত বাক্যে এ শব্দ দ্বারা পুরুষকেই বোঝাচ্ছে। বাংলাভাষায় কিছু বাক্য আছে যা নারীরাই কেবল ব্যবহার করে থাকে যেমন, "থাক আমার সংসার, আমি চললাম", "ভালো হবে না কিন্তু, হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি", আমার মরণ হয় না কেন" (হুমায়ুন, ১৯৯৩ : ৪৭)।

অশালীন শব্দের ব্যবহার

ভাষার লৈঙ্গিকতার অপর একটি বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সরাসরি অপমাসূচক কথা বা অঙ্গভঙ্গি, যার লক্ষ মূলত নারী। বাংলা ভাষায় গালি দ্বারা নারীকেই আক্রমণ করা হয় এবং অনেক গালি নারীর সাথে আপত্তিকর যৌন সম্পর্ক বা সতীত্ব বিষয়ক, সে নারী অন্যপক্ষের কন্যা, জায়া, জননী যে কেউই হতে পারে, যেমন: খানকির পোলা, ভাতারখাগী ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনের ভাষায় নারীকে নানাভাবে অপদস্ত করা হয়, যা পুরুষের ক্ষেত্রে হয় না। হাতে চুড়ি পরিধান নারীর অলংকার হলেও পুরুষের জন্য তা অপমানজনক। বিজ্ঞাপনে তাই দেখা যায় পুরুষ মাছ বিক্রেতা নারী ক্রেতাকে বলছে যে তার মাছ খারাপ হলে ক্রেতার চুড়ি পরিধান করে বসে থাকবে। রং ফর্সাকারী ক্রিমসমূহের মূল লক্ষ্য নারী, তাই বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'মানুষ' হিসাবে নারীর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, সে স্থান দখল করে হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, ছলনাময়ী, অভিমানী, লাজুক নারী যে পুরুষের মন জয় করে বাবা, ভাই ,স্বামী কিংবা ছেলের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে জীবন পার করে দেবে। সমাজে নারীর প্রেয়সী- কন্যা-জায়া- জননী ছাড়া আর কোন অবয়ব আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য পর্যাপ্ত সচেতনা এখনও অনুপস্থিত, এজন্য মূলত দায়ী সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। অসূর্যপশ্যা নারী পুরুষের কাম্য, দুধে আলতা যার গায়ের রঙ, সাত চড়ে যে রা কাড়ে না, তেমন মেয়েই তো স্বামী-সোহাগিনী হয়ে জীবন পার করে দিতে পারে নির্বিঘ্নে। অনেক ভাষাতেই নারীর মানবিক গুণাবলি তার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে ছাপিয়ে ওঠতে পারে না।

নারীর ভাষা পুরুষের ভাষা

এ কথা অনস্বীকার্য, নারী ও পুরুষের ভাষায় পাথর্ক্য রয়েছে। পাথর্ক্য রয়েছে নারী ও পুরুষের প্রতি ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেও। এ পাথর্ক্য শুধু ভাষাতাত্ত্বিক নয়, এর অতিরিক্তও অনেক কারণ থাকতে পারে। সাধারণ প্রচলিত একটি ধারণা রয়েছে যে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি কথা বলে, নারীরা কথা বলতে শুরু করলে থামতে পারে না, নারীর কথা বা আলাপচারিতা প্রসঙ্গে অনেক অপমানসূচক বিশেষণ ব্যবহার করা হয় যেমন, বকবক করা, প্যাঁচাল পারা, ভ্যাজর ভ্যাজর করা, ঘ্যানঘ্যন বা ভ্যানভ্যান করা, যা পুরুষ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় না। নারীরা কথা বেশি বলে, অপ্রয়োজনে বলে, উদ্দেশ্যহীনভাবে বলে- নারীর ভাষা সম্পর্কে এসবই প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণা। বিভিন্ন ভাষায় এ সম্পকে বেশ কির্ছু প্রবাদ পাওয়া যায়, যেমন-

> Women's tongues are like lamb's tales- they are never still (English),
> The tongue is the sword of a woman and she never lets it become rusty. (Chinese)
> Nothing is so unnatural as a talkative man or a quiet woman. (Scottish)
> Three women make a market. (Japanese)

কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে পাশ্চাত্যে এ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে যা সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য দিচ্ছে। বিভিন্ন জাতিগত ও সামাজিক দলে পরিচালিত এসব গবেষণাকর্ম মূলত হয়েছে আমেরিকা, বৃটেন, নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে, নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারে নাটকীয় পার্থক্য রয়েছে যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, গড়ে ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অনেক বেশি কথা বলে। নারী-পুরুষের কথোপকথনে নারীদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি সময় ধরে কথা বলে যা গড়ে নারীর দ্বিগুণ। এটি কেবল প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে নয়, আমেরিকার বিদ্যালয়ে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে শ্রেণিকক্ষে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি কথা বলে এবং শিক্ষকের সময় বেশি নিয়ে থাকে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের কারণে আমেরিকার স্কুলসমূহে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে যেন ছেলেমেয়ে সকলে সমভাবে কথা বলার সুযোগ পায়। (Thomas et al, 2004)।

নারী ও পুরুষের ভাষা গবেষণার ফলে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দিক উন্মোচিত হয়েছে- পুরুষ কথা বলার সময় নারীকে বাধগ্রস্ত করে অনেক বেশি পরিমানে যতটা না করে অন্য পুরুষকে কিংবা একজন নারী একজন পুরুষকে বা অন্য একজন নারীকে। পুরুষেরা নারীর কথা বাধাগ্রস্ত করে , তাঁরা মনে করে কথা বলার অধিকার নারীদের চেয়ে তাদেরই বেশি আর নারীরা মনে করে পুরুষদের চেয়ে তাদের অধিকার কম। গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, একই লিঙ্গভুক্ত কথপোকথনে নারীদের অন্য নারীর সঙ্গে একই

সময়ে কথা বলার প্রবণতা পুরুষদের চেয়ে বেশি তবে তারা অন্যের কথাকে বাধাগ্রস্থ করে না। যে কারণে মনে করা হয় নারীরা কথা বলার সময় অন্যের সাথে বেশি মাত্রার সহযোগিতাপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ মনোভাব বজায় রাখে (Coates, 1993)।

নারী ও পুরুষের কথাবার্তা প্রসঙ্গে প্রায় প্রত্যেক সমাজেই কিছু বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন, মেয়েরা বেশি কথা বলে, পুরুষেরা কসম কাটে বেশি, মেয়েরা কথাবার্তায় বেশি বিনয়ী, কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা থেকে বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। সমাজভাষাজ্ঞানী জেনিফার কোটস *Women, Men and Language* গ্রন্থে কথোপকথনে নারী ও পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, স্বাভাবিক কথপোকথনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা পালা বদলের (tern taking) মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যায়ের জিমারম্যান ও ওয়েস্ট পরিচালিত একটি গবেষণা কর্মের উল্লেখ করেন। তাঁরা দুজন নারীর মধ্যে দশটি, দশটি দুজন পুরুষের মধ্যে এবং এগারটি একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে কথোপকথন রেকর্ড করেন। তাঁদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল কথোপকথনের সময় কখন পালা বদল ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, কথা বলার সময় পালা বদল মসৃণভাবে কাঠামো অনুযায়ী হয় না। তাঁরা একই লিঙ্গভুক্ত এবং ভিন্ন লিঙ্গভুক্ত কথোপকথনে অংশগ্রহণকৃত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করেন। পালবদলের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় দেখা যায়, অধিক্রমণ (Overlap) এবং বাধাগ্রস্তকরণ (interruption)। তাঁদের গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

টেবিল-১

	প্রথম বক্তা	২য় বক্তা	মোট
অধিক্রমণ	১২	১০	২২
বাধাগ্রস্তকরণ	৩	৪	৭

একই লিঙ্গভুক্ত (নারী-নারী কিংবা পুরুষ-পুরুষ) বক্তাদের ক্ষেত্রে সর্বমোট ২০টি কথপোকথন দেখা যায় যে সর্বমোট অধিক্রমণ ঘটেছে ২২টি এবং বাধাগ্রস্তকরণ ৭টি, যার মধ্যে ১ম ও ২য় বক্তার ক্ষেত্রে অধিক্রমণ যথাক্রমে ১২ ও ১০ এবং বাধাগ্রস্তকরণ ৩ এবং ৪, অর্থাৎ দুজন বক্তার ক্ষেত্রেই প্রায় কাছাকাছি সংখ্যক অধিক্রমণ এবং বাধাগ্রস্তকরণ ঘটেছে।

টেবিল-২

	পুরুষ বক্তা	নারী বক্তা	মোট
অধিক্রমণ	৯	০	৯
বাধাগ্রস্তকরণ	৪৬	২	৪৮

টেবিল-২ অনুযায়ী কথোপকথন হয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে সর্বমোট ১১টি। এতে দেখা যাচ্ছে মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে পুরুষ বক্তা ৯ বার এবং বাধাগ্রস্ত করেছে ৪৬ বার। অন্য দিকে নারী বক্তা ২ বার অধিক্রমণ করেছে এবং একবারও বাধাগ্রস্ত করেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রী লিঙ্গভুক্ত মানুষের কথোপকথন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বেশি, এ ক্ষেত্রে মূলত পুরুষ বক্তরাই বাধাগ্রস্ত করছে এবং নারী বক্তার কথা বলার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। আবার অন্যদিকে নারীরা পুরুষের কথাবলার অধিকার কোন অবস্থায় ক্ষুণ্ন করছে না। তারা পুরুষের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। অনবরত বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে কথোপকথনে নারীরা সাধারণত নিশ্চুপ হয়ে পড়ে, তাদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে যায়। অনেক সময় মনে করা হয় যে নারী, পুরুষের চেয়ে বেশি বিনয়ী, অন্যের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ, প্রতিক্রিয়াশীল। তবে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে পুরুষ বেশি কথা বলে, বেশি প্রশ্ন করে। অন্যদিকে নারী ব্যক্তিগত পরিবেশে বেশি কথা বলে (Bauer et al, 2006)। নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি ইতস্তত বোধ করে, এবং বিভিন্ন শব্দ অর্থহীনভাবে পুরক হিসাবে ব্যবহার করে যেমন, ইংরেজিতে I think, sort of, kind of এবং বাংলায় ও মা, ছিঃ, অসভ্য, পাজি, কি মিষ্টি, বলে কি (হুমায়ুন, ১৯৯৩) –এসব শব্দ বেশি ব্যবহার করে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটা নিশ্চিত, নারীরা অনিশ্চয়তাসূচক শব্দাবলি বেশি ব্যবহার করে, পুরুষের তুলনায় কম আত্মবিশ্বাসী এবং কোন কিছু সম্পর্কে খুব জোরালো মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করে। এছাড়াও ভাষার মর্যাদার্পূণরূপ (prestige pattern) যোজক প্রশ্ন (tag question), উচ্চ স্বরগ্রাম (rising intonation), উচ্চ মীড় (higher pitch),পরোক্ষ উক্তি (indirect interrogative), ট্যাবু (taboo), সঙ্কেতবদল (code switching) - নারীর ভাষায় বেশি পাওয়া যায় (হুমায়ুন, ১৯৯৩)।

নারী ও পুরুষের কথোপকথনের বিষয়বস্তু পৃথক হয়ে থাকে। নারীরা অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যক্তিগত বিষয় যেমন পরিবার, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি আলোচনায় নিয়ে আসতে পারে। পুরুষেরা সাধারণত এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে খেলাধুলা, রাজনীতি বা সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। তারা প্রায়ই তথ্যের আদান প্রদানে চেষ্টা করে। নারীর কথোপকথনে সম্পর্ক তৈরি ও পরিচর্যা এবং অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া, শ্রোতা হিসাবেও সে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করে।

নারী ও পুরুষ একই সমাজ, পরিবার, বিদ্যালয়, এমনকি একই কর্মস্থলে পাশাপাশি অবস্থান করা সত্ত্বেও ভাষায় এই পার্থক্য কেন? এর কারণ হিসাবে দুটো তত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রথমত– আধিপত্য তত্ত্ব (Dominance theory), এ তত্ত্ব মতে নারী পুরুষের ভাষা পার্থক্যের মূল কারণ ক্ষমতার অসম বন্টন। পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করে, তারই প্রভাবে নারীর ভাষা পুরুষের চেয়ে ভিন্নতর হয়। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন পাওয়া যায় Fishman (1980) এবং DeFrancisco (1991)-এর গবেষণা থেকে (Thomas et al, 2004)। তবে এই তত্ত্বের দুটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়, এতে সকল নারীকেই

ক্ষমতাহীন মনে করা হয় এবং এমন ধারণা জন্মায়, নারীকে যেন সবসময়ই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। দ্বিতীয়ত- পার্থক্য তত্ত্ব (Differance theory) মতে, নারী পুরুষের ভাষা পার্থক্যের মূল কারণ ক্ষমতার পার্থক্য। পৃথিবীর বেশির ভাগ সমাজে দেখা যায় শারীরিক, আর্থিক এমন কি কর্মক্ষেত্রেও পুরুষ নারীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। পুরুষের বৈষয়িক আধিপত্যই নারীকে ভাষা ব্যবহারে অধনস্ত করে তুলেছে। এ তত্ত্বে মনে করা হয়, নারী ও পুরুষের ভাষায় পার্থক্যের কারণ তাদের জীবন যাপনের ভিন্নতা। শৈশবে দেখা যায় একই লিঙ্গভুক্ত শিশুরা একত্রে খেলাধুলা করছে, পরবর্তীসময়ে তাদের বন্ধুত্বও হয় একই লিঙ্গভুক্তদের সাথে, ফলে গড়ে ওঠে একই দলভুক্তির একটি মানসিকতা এবং 'উপসংস্কৃতি' (subculture), এই উপসাংস্কৃতিক দলে তাদের কথোপকথনের আদর্শ নির্ধারণ করে। Debborah Tannen (1990, 1991)-এর গবেষণাকর্ম এ তত্ত্বটিকে সমর্থন করে (প্রাগুক্ত)।

নারী, তাদের সম্পর্ক থেকে সহযোগিতা, অন্তরঙ্গতা, সমতা, সমর্থন, অনুমোদন আশা করে থাকে। অন্যদিকে পুরুষ মর্যদা, স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যের সাথে সমঝোতা ও সমতার বিষয়টি সম্পর্কে কম সচেতন থাকে। জটিলতা তৈরি হয় তখনই, যখন নারী ও পুরুষ একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে যায়। তাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি করতে পারে। অনেকে জৈবিক উপদানের সাথে এ বিষয়গুলোকে সম্পৃক্ত করতে চায় যেমন, নারী পুরুষের হরমোন নিঃসরণ পার্থক্যই পুরুষকে অধিক আগ্রাসী আচরণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তবে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ- মেয়ে শিশুকে শৈশব থেকেই বিনয়ী, আত্মত্যাগী হওয়ার জন্য উৎসাহী করা হয়, শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যদিকে ছেলে শিশুদের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব পরায়ন হওয়ার জন্য উৎসাহী করা হয়। সমাজিকীরণের এই কাঠামো জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। এই সমাজ ব্যবস্থাই মূলত শিশুকে ভাষাসহ সবক্ষেত্রে 'নারী' ও 'পুরুষ' পরিচিতি দান করে এবং নারীকে পুরুষের চেয়ে কম ক্ষমতাশালী করে গড়ে তোলে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলাফল এক নয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, পরিবার, স্কুল, গণমাধ্যম, উপাসানালয় সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানই মানুষকে ক্রমাগত নারী ও পুরুষ করে তুলছে, যার ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। ঘটে গেলে তা কঠোরভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তাদের সামাজিক ভূমিকা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ও মনোভাব শেখে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এতে করে সে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও জীবন যাপন প্রণালীর সঙ্গে সংগতি বিধানে সক্ষম হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিকীকরণ হল মানুষকে সংশ্লিষ্ট সামাজিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা। ইউএনজিইআই-ইউনেস্কোর একটি প্রতিবেদনে (২০০১) বলা হয়, "জেন্ডার পক্ষপাত ও লৈঙ্গিক ছাঁচিকরণগুলো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছেলে ও পুরুষ এবং মেয়ে ও নারীর মধ্যে অন্তঃস্থিত হয়।"

পরিবার ও সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান পরিবার। এই পরিবারেই প্রথম প্রোথিত হয় জেন্ডার বৈষম্য নামক বিষবৃক্ষের বীজ। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে নানাভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে। "নারীর জন্ম যেন পুরুষেরই জন্য, তার জীবন যেন পুরুষের সেবায় ধন্য। পুরুষ তার পৌরুষত্বের প্রকাশ কেবল শারীরিক নির্যাতন দিয়েই নয়, ভাষাকে আশ্রয় করে মানসিক নির্যাতনও করে থাকে যা 'ভারবাল এবিউজ' বা 'মৌখিক নির্যাতন' নামে পরিচিত" (সিকদার ও নাসরীন, ২০০৯ : ১৬)।

জীবন পরিক্রমার প্রথম পর্যায়, জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত পরিবারে মেয়ে শিশুদের সাধারণত,

১) কথা বার্তায় এবং আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়;

২) ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়;

৩) উচ্চ স্বরে কথা না বলতে অভ্যস্থ করানো হয়;

৪) বাবার ঘরে মেয়ে শিশুরা কিছুদিনের অতিথি, স্বামীর ঘরই তার আসল ঘর- এ কথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয় ;

৫) পরিবারে বাবা এবং ভাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি- এ কথা আচার আচরণের দ্বারা ভাল করে বুঝিয়ে দেয়া হয়;

৬) মাছের মাথা, মুরগীর রানসহ লোভনীয় অংশগুলিতে ছেলেদেরই অগ্রাধিকার, বৈষম্যপূর্ণ আচরণ মেয়ে শিশুটিকে অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেয়, শিশুটি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক পরিবারে মেয়ে শিশু অপ্রত্যাশিত, তাই পরিবার তাদের বোঝা মনে করে।

জীবন পরিক্রমার দ্বিতীয় স্তর–বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের বাইরের প্রযুক্তি নির্ভর জীবনের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও মেয়ে শিশুকে গৃহমুখী করা তোলা হতো, সাজসজ্জার উপকরণ দিয়ে তাকে ঘরে থাকতে উৎসাহিত করা হতো। এসময় মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হতে পারে- যে কারণে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এভাবে ক্রমশ আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে ওঠা একজন মানুষের ভাষায় অধনস্তের সীল পড়তে থাকে প্রতিনিয়ত।

তৃতীয় স্তর– এ স্তরে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবেও নারী, পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার হয়। মানুষ হিসাবে তার স্বতন্ত্র কোন পরিচয় তৈরি হয় না। সর্বশেষ, বার্ধক্যে নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানেরও কোনো পরিবর্তন হয় না। মূলত অবস্থা হচ্ছে মানুষের বস্তুগত চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি অবস্থার উন্নতির অর্থ হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অবস্থান সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। অবস্থান সমাজ ও

পরিবারে মানুষের মর্যাদা, ক্ষমতা অর্জন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। নারী তার সামগ্রিক জীবনচক্রে প্রথমে পিতা ও ভাই, তারপর স্বামী এবং সর্বশেষে পুত্রের তত্ত্বাবধানেই জীবন অতিবাহিত করে। তার অবস্থা ও অবস্থান নয়, উর্ধ্বতনের পরিবর্তন ঘটে কেবল।

পরিবারে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি মেয়ে শিশুদের সযতনে নারী করে তোলে। কোমল স্বভাব, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, ধীরস্থির, লাস্যময়ী, বাধ্যগত এসব স্বভাবের ব্যত্যয় ঘটলে পুরুষালী বলে নিন্দা করা হয় এবং তা প্রতিহত করা হয়। আবার ছেলেরা এসব গুণের অধিকারী হলে "মেয়েলিপনা" দোষের জন্য তিরস্কৃত হয়।

বিদ্যালয় ও সামাজিকীকরণ

সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে যদি সহশিক্ষা থাকে তাহলে জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টি প্রকট হয়ে ওঠতে পারে। শুধু আচরণ নয় বরং পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসূচীও এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করে থাকে। পাঠ পুস্তকের ভাষা সর্বত্র জেন্ডার সংবেদী থাকে না। কন্যা-জায়া-জননী এবং গৃহিনী-রাঁধুনী-সেবিকা হিসাবে নারীকে দেখানোর চেষ্টা পরিপূর্ণতা লাভ করে যেন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে। জেন্ডার অসংবেদী ভাষার ব্যহার তাকে চিরাচরিত অধনস্ত করেই রাখে। পাঠ্যবইয়ের কোথাও নারীকে অন্যের পত্নী রূপে দেখানো হয় যেন তার আর কোন পরিচয় নেই। Lenore Weizman ও অন্যরা 'Sexual socialization in picture books in pre-school children' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। গবেষণায় তাঁরা পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট দিকসমূহ চিহ্নিত করেন। তাঁদের গবেষণায় বলা হয়, গল্পে ও ছবিতে পুরুষেরা নারীদের চেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে, এর অনুপাত ১১:১ (বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০১৩)। পাঠ্যপুস্তক নারীকে তার অধনস্ত ভূমিকা থেকে বের হয়ে পুরুষের সমান গুরুত্ব অর্জনের পথে বেশির ভাগ ক্ষেত্রই সহায়ক কোন ভূমিকা পালন করতে পারছে না, পাঠ্যক্রম থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য কৃষিবিজ্ঞান নির্ধারণ করা হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয়ে মেয়েরা কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পারলেও ছেলেদের গার্হস্থ্য অর্থনীতি পড়ার কোনো নজির নেই। মানসিকতাই এজন্য দায়ী, নারীরা ঘরের কাজ আর পুরুষ বাইরের কাজ করবে, এটাই এ সমাজে প্রচলিত নিয়ম। আবার, উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় মহিলা, স্ত্রীলোক প্রভৃতি জেন্ডার অসংবেদী শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। সর্বত্র নারীকে মর্যাদাহীন এবং দুর্বলভাবে উপস্থাপন করা হয়। তবে বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক থেকে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে, যার ইতিবাচক ফলাফল পাঠ্যপুস্তকগুলোতে দেখা যাচ্ছে, "পাঠ্যপুস্তকসমূহের রচয়িতা/সম্পাদকদের মাঝে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বজায় রাখার সচেতন প্রয়াস কিছুক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি– যা প্রশংসনীয়। তবে গবেষণার

ফলাফল বলে বইগুলোকে 'পুরোপুরি জেন্ডার ভ্রান্তিমুক্ত' হওয়ার পথে আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে" (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০০৭-২০০৮)।

গণমাধ্যম

লৈঙ্গিকতার আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যেমন: গণমাধ্যমে নারীর বাহ্যিক বা দৈহিক সৌন্দার্যকে আকর্ষণীয়ভাবে সবসময় উপস্থাপিত হয়, অন্যদিকে পুরুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তথা তার ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দেয়। গণমাধ্যম সামাজিকীকরণের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান, অথচ এখানেই সবচেয়ে বেশি জেন্ডার অসংবেদী ভাষা ও চিত্র ব্যবহার করা হয়। সংবাদপত্রে জেন্ডার অসংবেদী ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়,কিছু কিছু শব্দ আছে যা পুরুষবাচক হলেও নারী পুরুষ উভয়ই বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, যেমন- ছাত্র, সভাপতি, দলনেতা- এগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থী, সভাপ্রধান, দলপ্রধান ব্যবহার করে জেন্ডার পক্ষপাত দুষ্টতা থেকে মুক্ত করা যায়। যখন কোনো পেশার সঙ্গে নারীবাচক শব্দ যা প্রত্যয় যোগ করা হয় যেমন- প্রমীলা খেলোয়ার, লেডি ডাক্তার তখন এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়, এসব পোশায় নারীরা ব্যতিক্রম এবং পুরুষই এসব পেশার জন্য উপযুক্ত। "বিভিন্ন ফিচার পাতা এমনকি অধিকাংশ পত্রিকার নারী বিষয়ক পাতায়ও নারীর সনাতনী বা 'স্টেরিওটাইপ' ভাবমূর্তি অধিকমাত্রায় প্রতিফলিত হয়" (রহমান, ২০০৯ : ৯৩)। টেলিভিশন, বেতার এবং চলচ্চিত্রেও জেন্ডার অসংবেদী ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, নারীকে স্নেহময়ী, মমতাময়ী, দুর্বল, পরনির্ভরশীল, সৌন্দর্য ও যৌনতার প্রতীক, সর্বোপরি পুরুষের অধনস্ত হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

"পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মে নারীকে পুরুষের অধনস্ত করে দেখাা হয়েছে।... ধর্মে নারীকে মর্যাদা দানের কথা উল্লেখ থাকলেও নারীর তুলনায় পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নারীকে পুরুষের অধীন বলে উল্লেখ করে নারী-পুরুষের জেন্ডার সম্পর্ককে ভারসাম্যহীন করে ফেলা হয়েছে" (হোসেন ও অন্যান্য, ২০০৬ : ৭০৭)। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবা হয় না। ধর্মীয় নেতারা মনে করেন "নারী পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্টতর। নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-খুন ইত্যাদির জন্য নারীই দায়ী। তারা মনে করেন নারী নেতৃত্ব ঠিক নয় এবং পুরুষের (পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র) সন্তুষ্টি বিধানই নারীর দায়িত্ব..." (মোহাম্মদ, ২০১২ : ১৫৫)। এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে অবাক করে যে বিষয় হলো, যারা ধর্মের অনেক বিধি বিধান মানে না, ধর্ম পালনে আগ্রহী নয় এবং গণতান্ত্রিক বোধ সম্পন্ন বলে পরিচিত এমন ব্যক্তিদের অনেকের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণা বর্তমান। সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রাচীন আইনশাস্ত্র 'মনুস্মৃতি' হিন্দু নারীদের জন্য চরম অবমাননাকর। এ গ্রন্থে, নারীকে কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি, নেই তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য (অনলাইন, BBC NEWS বাংলা, ২৭ অক্টোবর,

২০২০)। মনুসংহিতায় প্রসঙ্গে বলা হয়, "এই গ্রন্থের আইনসমূহ নারীসমাজের স্বার্থের চরম প্রতিকূল। সব বর্ণের নারীকে এখানে শূদ্রের সমতুল্য গণ্য করা হয় এবং নারীকে ভোগ্যপণ্যের অধিক বিবেচনা করা হয় না" (হোসেন ও অন্যান্য, ২য় খণ্ড, ২০০৬ : ২৮৩)।

নারী ও পুরুষের ভাষায় লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, আবার নারীর প্রতি ব্যবহৃত ভাষাও পুরুষের চেয়ে পৃথক। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠানই কম-বেশি নারীকে পুরুষের নীচে অধিষ্ঠিত করেছে, যা নারীর ভাষা ও আচরণে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত হয়। একই ধরনের পোশাক পরিহিত সদ্যজাত শিশুকে ছেলে বা মেয়ে হিসাবে পৃথক করা যায় না, তাই অনেক সমাজেই দেখা যায় শিশুদের পৃথক পোশাক পরানো হয় তাদের লৈঙ্গিক পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য। এ থেকেই শুরু হয় জেন্ডার বৈষম্য, ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন রং, ভিন্ন খেলনা সামগ্রি–সমাজ নির্দিষ্ট করে দেয়। এই জেন্ডার বৈষম্যই ক্রমশ নারীকে অধনস্ত করে তোলে, ভাষায়ও এর ব্যাপক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, নারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব সমাজের সকল পর্যায়ে সমানভাবে বিরাজমান নয়। শিক্ষা, শ্রেণি, পেশা, গ্রাম-শহরভেদে ভিন্ন তা হতে পারে। আবার, নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অংশ গ্রহণ, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কারণে পুরোনো ধ্যান-ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নারী প্রধানমন্ত্রী কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসাবে নারীদের ব্যাপক উপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়নের সুস্পষ্ট নিদর্শন। বর্তমানে নারীর জন্য জেন্ডার নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা নারীর প্রতি ভাষাব্যবহারকারীর ইতিবাচক মনোভঙ্গিকে প্রতিবিম্বিত করে। সমাজে সুশিক্ষার প্রসার এবং সংসারে মেয়েদের আর্থিক অবদান খুব ধীরে হলেও তাদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান পরির্বতনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে, ফলে কিছু ক্ষেত্রে ভাষা পার্থক্য কমে আসছে, বিশেষত উচ্চশিক্ষিত ও কর্মজীবী নারীদের ভাষার সাথে তার সহপাঠী-সহকর্মী পুরুষের ভাষা পার্থক্য নেই বললেই চলে। মানুষ হিসাবে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্য দূরীভূত হলে জৈবিক পার্থক্য ছাড়া নারী পুরুষের ভাষা পার্থক্য বলে আর কিছু থাকবে না।

সহায়ক গ্রন্থ

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পাদিত) (১৯৮৫)। *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

কাদির, আবদুল (সম্পাদিত) (২০১৬)। রোকেয়া-রচনাবলী। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

নাথ, মৃণাল (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

ফেরদৌস, রোবায়েত ও জামান, ফিরোজ (২০০৮)। 'বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা' *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টডিজ, পার্ট-ডি)*, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর, ২০০৭-২০০৮

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। (২০১৩)। *জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য।* ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

মোহাম্মদ, আনু । (২০১২)। *নারী পুরুষ সমাজ*। ঢাকা: সংহতি প্রকাশন।

রহমান, অলিউর। (২০০৯)। "সংবাদ মাধ্যমে জেন্ডর প্রতিকৃতি ও সংবদপত্রের জেন্ডার পাতা", *জেন্ডর ও গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

সিকদার, সৌরভ ও নাসরীন, সালমা। (২০০৯)। *বাংলা ভাষায় নারী শব্দাভিধান*। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

হুমায়ুন, রাজীব । (১৯৯৩)। *সমাজভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: দ্বীপ প্রকাশন।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত) (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

Bauer, laurie.Hoimes, Janet & Warren, Paul. (2006). *Language Matters.*UK: Cromwell Press Ltd.

Clements, Phil & Spinks, Tony. (2000). *The Equal opportunities Handbook.*London: Kogan Page Limited

Coates, Jennifer. (1993). *Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language* U.S.A.: Routledge.

Fischer. J.L. (1958). 'Social Influences on the Choice of a Linguistic Variant'. *Word* 14.47-56, reprinted in Hymes 1964, 483-488

Jespersen, O. (1922). *Language*. London: George Allen and Unwin.

Thomas, Linda et al. (2004). *Language, Society and Power : An Introduction*. London: Routledge.

Trudgill, P. (1974). *Sociolinguistics*. Harmonds Worth: Penguin.

UNESCO. (2001). *Gender Equality in Basic Education*, UNGEI- UN Girls' Education Initiative.

Van de Vijer, Ruben. (1998). *The iambic issue: iambs as a result of constraint interaction* (Doctoral dissertation). Free university of Amsterdam. HIL dissertation 37